রামায়ণ প্রেমকথা

উত্তম ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

'রামায়ণ প্রেমকথা' লিখতে গিয়ে অনেক 'পদাম্বুজে' প্রণাম জানাতে হয়েছে। মহামুনি বাল্মীকি ছাড়াও কৃত্তিবাস, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ থেকে শুরু করে রাজশেখর বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের কাছে ঋণ স্বীকার করা লেখকের প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য।

রামায়ণ নয়, রামায়ণ প্রেমকথা। বেছে নেওয়া হয়েছে প্রধান চরিত্রগুলি অবশ্যই। রামায়ণ যেহেতু মহাভারতের মত বিশাল নয়, এর শাখা-প্রশাখা মূল কাহিনী থেকে লতায়-পাতায় জড়িয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েনি, মোটামুটিভাবে একটি কেন্দ্র ধরে আবর্তিত হয়েছে, তাই মুখ্য চরিত্রগুলোই বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। রাম-সীতা ছাড়াও রাবণ, দশরথ, বিভীষণ, বালী, ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণ ও ভরত অনিবার্য্যভাবে আসবেই। এর পাশে পাশে অহল্যা, শবরী ও বেদবতী যুক্ত হয়েছে।

মোট চৌদ্দটি কাহিনী যার মূল সুর প্রেম। এখানে রাম-সীতার প্রেম আখ্যানের চারটি ভাগ ঃ মিথিলা, পঞ্চবটী, অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাস। 'পাতাল-প্রবেশ' নিয়ে একটি কাহিনী সম্ভব ছিল, কিন্তু নতুন প্রেমবৈচিত্র (ট্র্যাজিক হলেও) কিছু খুঁজে পাইনি তার মধ্যে। শুধু সকলের জানা গল্পাংশ শুনিয়ে কী হবে? আমার মনে হয়েছে, 'বনবাসে'র মধ্যে সীতা ট্র্যাজেডির প্রকৃত catastroph। 'পাতাল প্রবেশ' একটি রুটিন মাফিক অন্তমাত্র—যা আর কোন মাত্রা যোগ করে না 'বনবাসে'র হাহাকারের পর। তাছাড়া ওই অংশে 'প্রেম' আবিষ্কার করা সুকঠিন লেগেছে—আমার ক্ষমতায়।

লিখতে গিয়ে ভেবেছি মূলতঃ পাঠকের কথা। তাদের কেমন লাগবে রামায়ণের এইসব চরিত্রের ভালোবাসার দিকগুলোর উপর আমার আলোকপাত! স্বতঃস্ফূর্ত মনে হবে কি? তাই মূল কাহিনী থেকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সরে এসেছি চরিত্রের এই দ্যোতনা সৃষ্টির জন্য।

আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে রামায়ণের অলৌকিক ও অতিশয়োক্তিযুক্ত অংশকে আজকের বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিচার করতে গিয়েও বোধহয় একটু সাবধানতা প্রয়োজন। ভুললে চলবে না—সাহিত্যে permissible exaggeration বলে একটা কথা আছে। Permissible এর পরিমাপ নিয়ে বিতর্ক ব্যক্তিগত মতামত ও মনোবৃত্তির পর্য্যায়ে চলে যায়। তবু রামায়ণ ও মহাভারতের epic গুণাবলীর বিচার ও বিশ্লেষণ করতে বসে শুষ্ক অ্যাকাডেমিক মানদণ্ড সব সময়ে ব্যবহার করলে ভাল লাগবে না। হৃদয়ের ভাল-খারাপ লাগার ব্যাপারটা এসে পড়বেই।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র উৎকর্ষ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু চরিত্র চিত্রায়ণের দৃষ্টিভঙ্গী ও উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ আছে। বাল্মীকির বিষ্ণু-অংশ শ্রীরাম মাইকেলের কলমে 'ভিখারি রাঘব'। মাইকেলের দৃষ্টিতে আদি রামায়ণের লক্ষ্মণ এক 'তস্কর সদৃশ' সুযোগসন্ধানী যোদ্ধামাত্র যে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতি অবলম্বন করেছিল। মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ বধের পদ্ধতি ও ঘটনা একই, কিন্তু লক্ষ্মণ চরিত্র এক অনৈতিক আদর্শহীন 'বেতনভুক' সৈনিকের মত, যে নিরস্ত্রকে হত্যা করতে পারে। সেই অর্থে শাস্ত্রমতেও হয়ত সে অ-ক্ষত্রিয়। রক্ষরাজ রাবণ

রাক্ষস নয়, 'দশমুণ্ড-কুড়িহাত-বিংশতিলোচন' নিয়ে সে প্রতিভাত হয়নি। সে এক স্নেহশীল পিতা যে পুত্রশোকে বলতে পারে 'কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে'। এক্ষেত্রে দশরথের সাথে তার অমিল কোথায়? আর ধার্মিক বিভীষণ চিরকুখ্যাত হয়ে যায় 'ঘরের শত্রু' হিসেবে।

সরল কথা, মাইকেল বাল্মীকিকে মান্য করেন নি।

কৃত্তিবাস ওঝা কেন শবরীকে ভুলে গেলেন জানি না। (অন্ততঃ আমার কাছে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যা 'মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে কৃত্তিবাস পণ্ডিত মহানুভব কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত' ও তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স দ্বারা ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণ রয়েছে, তার মধ্যে শবরী নেই)। অথচ কৃত্তিবাস কল্পিত, কিন্তু বাল্মীকির রচনায় অনুপস্থিত, বিভীষণপুত্র তরণীসেন চরিত্র আছে। মহাকবি কৃত্তিবাস অনুভব করেছেন, আদি কাব্যে যাই থাকুক, নিষাদ কোন দিন প্রতিষ্ঠা পাক বা না পাক, বিভীষণের একটি রাম-ভক্ত পুত্র যেন লঙ্কার হয়ে যুদ্ধ করে—এবং তার প্রাণনাশের মন্ত্র জ্ঞাপন করার মত কঠোর ধর্মপরায়ণ যেন বিভীষণ চরিত্র হতে পারে! তাই তরণীসেন চরিত্র উদ্ভাবন।

বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস ও মাইকেলের রচনায় এর ফলে সাহিত্য-উৎকর্ষ ও নাটকীয়তা উচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। তাদের চোখে ধর্মপরায়ণতা এবং অমানবিক নিষ্ঠুরতা বহু সময়ে এক হয়ে গেছে। আজকের যুগের বিচারে সেই তথাকথিত ধর্মপরায়ণতা মানবতা বিরোধী হয়ে 'ধর্মান্ধতা' বলে বিবেচিত হবে।

অলৌকিকতা ও আতিশয্যের সমালোচনা করা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের রচনাতেও অবাস্তব অথবা 'বর্তমান যুগে অচল'—এমন ধরনের চরিত্রের অভাব নেই। 'দেবদাস'কেই আধুনিক পাঠক এখন তেমন আদর্শ প্রেমিক ভাবে না। 'আদর্শ পুরুষ' তো নয়ই।

❋ ২ ❋

'রামায়ণ প্রেমকথা'র কাহিনীসমূহের বহু অংশ—বিশেষ করে প্রেম বা প্রেমানুভূতির দৃশ্য ও বিশ্লেষণে 'মধুকরী কল্পনা'র আশ্রয় নিতে হয়েছে—কিন্তু সে কল্পনা কোন 'অসম্ভবে'র সৃষ্টি করেনি বলে আশা রাখি। কৈকেয়ী দশরথের সবচেয়ে প্রিয় পত্নী ছিল, তাই তাদের বিবাহকালীন রোম্যান্টিক আচরণ বোধগম্য। কৈকেয়ীর রূপ ও সেবাপরায়ণতাও অস্বীকার করা হয় না। তাই কৈকেয়ী নয়, এই কাহিনীতে 'ভ্যাম্প' হয়েছে পরিচারিকা মন্থরা। কৈকেয়ী চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করা হয় নি—যা যুগে যুগে রামায়ণের পাঠকের বদ্ধমূল ধারণায় পর্য্যবসিত হয়ে রয়েছে।

বালীবধ যে রাম-চরিত্রে এক অমার্জনীয় কলঙ্ক, তার উল্লেখ মহাভারতেও আছে। দ্রোণবধের পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছিল—'বালীবধের জন্য রামের যেমন দুর্নাম হয়েছে, দ্রোণহত্যায় তোমারও চিরস্থায়ী অপযশ হবে।' আমার উদ্দেশ্য, পঞ্চসতীর অন্যতমা বালীপত্নী তারার প্রেমনিষ্ঠার চিত্রায়ণ। সুগ্রীবের সাথে দ্বিতীয়বার তারার বিবাহ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেটা রচনার সঙ্গে সঙ্গতরুচি বহন করত না। বালী মহৎ, তাই কোনও শ্লোকগীতিতে অনেকটা জোর করে গীতিকার 'গর্বিত বালী সংহারক রাম' (স্তবকুসুমাঞ্জলি) বলেছেন। বালীর আর কোন দোষ পাওয়া যায় নি। তাই 'গর্বিত' কথাটা যুক্ত করে রামের কাজকে justify করার চেষ্টা দেখে মনে পড়ে ইংরেজী প্রবচন—'Give a dog a bad name and hang him'. অর্থাৎ, এই 'bad name' জোর করেই দিতে হবে। কারণ তাকে মারতে হবে। তবু 'বালী ও তারা' কাহিনীতে

রাম যেভাবে বালীর ভৎর্সনা সহ্য করেছে, ক্ষমা চেয়েছে ও তারার অভিশাপেও 'তথাস্তু' বলেছে, তাতে 'অপরাধী' রাম-চরিত্রকে এই কাহিনীতে এক বিশেষ মাত্রা দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে।

'বিভীষণ ও সরমা'য় সরমার কৈশোর অবশ্যই লেখকের কল্পনা।

বিভীষণ কুলত্যাগী ও শত্রুশিবিরের সমর্থক অবশ্যই। কিন্তু বিভীষণকে সাধারণ এক বিশ্বাসহন্তার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। উৎকোচ, স্বার্থ কিংবা লঙ্কার সিংহাসনের জন্য সে রাবণকে ত্যাগ করে নি। সে জানত—এই যুদ্ধের পরিণাম রাবণের অন্যায় অহংবোধের বিনাশ। সীতাহরণের মত গর্হিত কাজ কেউই সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু সূর্পনখার প্রতি লক্ষ্মণের আচরণও যথেষ্ট হৃদয়হীন। কথায় কথায় কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, মুণ্ডচ্ছেদন রামায়ণের স্বেচ্ছাচারীদের সম্মানিত করে না। কিন্তু সীতাচরিত্র নিয়ে বিশেষ বিতর্ক নেই। মাইকেল পর্যন্ত এখানে বাল্মীকি-বন্দনা করতে বাধ্য হয়েছেন—'তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।' কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণ চরিত্র অবলীলাক্রমে কলঙ্কিত। এই কাহিনীতে বিভীষণের অন্তরযন্ত্রণা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সরমার প্রতি তার নির্দেশ ঃ '(তরণীসেনকে) বলবে, তোমার পিতা বিশ্বাসহন্তা, কিন্তু তুমি লঙ্কার মর্য্যাদা রক্ষা করবে।'

'ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা' কাহিনী বহুলাংশে মাইকেলের রচনার কাছে ঋণী। প্রেমিক ইন্দ্রজিৎ লেখকের সৃষ্টি। এখানে রামের সাথে সাক্ষাতে দূতী যায়নি, স্বয়ং প্রমীলাই গেছে। রামের সাথে 'যুদ্ধং দেহি' প্রমীলার অন্তরে যে শ্রদ্ধা-বিস্ময় জেগেছে, সেখানে রামকে 'ভিখারি রাঘব' মনে হবে না।

আমার মনে হয়, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কোনটারই চূড়ান্ত রূপ (extreme form) কাম্য নয়, কৃত্তিবাস বা মাইকেল নিজেরাও রামায়ণের চরিত্রগুলো নিয়ে কাব্যখেলায় সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা ('মধুকরী কল্পনা'র নির্দোষ প্রয়োগ ও গীতিগন্ধময় উচ্ছাস-আবেগ ছাড়া) নিশ্চয় সমর্থন করতে পারেন না।

'রাবণ ও মন্দোদরী'তে প্রিয়স্বামী রাবণ বিস্মিত যখন মন্দোদরী বলে—ইন্দ্রজিৎ আমার গর্ব, রাবণ আমার পুলক। লেখকের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়েছে রাবণবধের পর লঙ্কেশ্বর বিভীষণের সাথে মন্দোদরীর বিবাহ—যা রামায়ণে আছে। আদিকাব্যে বিবাহ ও নারীলাভ যেন যত্রতত্র কোন এক সম্পদ আহরণের মতো। হৃদয়বৃত্তি ও সম্মানের কোন ঠাঁই নেই। শুধুমাত্র 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' আধুনিক নারীজাতির পক্ষে কতখানি অবমাননাকর, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। তাই মহাকাব্যে বিবাহ ও দেহগ্রহণ যেন প্রাত্যহিক জৈবিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই পড়ে, তার বেশি কিছু নয়। বাল্মীকি রামায়ণে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, হৃদয়ের স্থান খুবই কম। হৃদয়বতীদের (যেমন সীতা) ভাগ্যে জনমদুখ ও চির ক্রন্দন ছাড়া আর বিশেষ কিছু দিতে অকৃপণ হতে পারেন নি মহাকবিরা। কেন? সেটাই চিরকালের প্রশ্ন। তাই পরিবর্তন অবধারিতভাবে এসে যায়।

'রাম ও অহল্যা'কে নিয়ে প্রেমকাহিনী হতে পারে না—কারণ অহল্যার প্রেম ইন্দ্রের সাথে। তবু অহল্যা-উদ্ধারে উভয়ের মনোভাবে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা রয়েছে। 'রাম ও শবরী'র ক্ষেত্রেও তাই। শবরী পরিচারিকা ও ভক্তিমতী। কিন্তু মনে হয়, নারীর ক্ষেত্রে ভক্তির মধ্যে প্রেমভাব লুকিয়ে থাকে। যেমন প্রেমিকা রাধা বা ষোড়শ গোপিনী কি কৃষ্ণভক্ত ছিল না? ভারতের ইতিহাসে মোগলযুগে ভক্তিমতী মীরাবাই কৃষ্ণকে 'স্বামী'-রূপে বরণ করেছিল কেন? তাই শবরীর চরিত্রের শেষদিকেই স্বল্পকালের এক টানাপোড়েনের আভাস দেওয়া হয়েছে।

ঊর্মিলা কাব্যে উপেক্ষিতা। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির সাথে তার স্বামীপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাণ্ডবীর ক্ষেত্রেও তাই। মহান ভরতের মহানুভবতা এবং রামভক্তির সাথে সে তার সৌন্দর্যশক্তি নিয়ে লড়াই করেছে। হার-জিতের মধ্যে কেটেছে তাদের প্রেমজীবন, খণ্ডজীবন।

'রাবণ ও বেদবতী' কাহিনীতে রাবণ চরিত্রে এক বিশাল নতুনত্ব দেখতে পাই। প্রেমিক রাবণ! বাল্মীকির রামায়ণে কামান্ধ রাবণ তাপসী বেদবতীকে শুধু দেহজভাবে কামনা করেছিল। এখানে রাবণের হৃদয়ে এক অনুভূতি জেগেছিল — যার সাথেই সে নিজেই পরিচিত নয়। এবং বেদবতীর প্রত্যাখ্যান রাবণ-চরিত্রকে উত্তরণের সুযোগ দিল না। বেদবতীর প্রতি রাবণের অত্যাচার লোলুপলালসা নয়। এক ব্যর্থ প্রেমিকের উগ্র প্রতিশোধাত্মক আবরণ মাত্র—যা বর্তমান কালেও প্রেমের প্রতিক্রিয়া বলে গণ্য হয়। তা হিংস্র বলেই নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয় ঠিকই, কিন্তু প্রেমানুভূতিকে সন্দেহ করা সবসময় ঠিক নয়। আজকের আইন শাস্তি দেয়, রাবণও শাস্তি পেয়েছে। বেদবতীর অভিশাপ সফল হয়েছে। কিন্তু পুণ্যবতী বেদবতী তাহলে সীতা হয়ে জনমদুখিনী রয়ে গেল কেন? সেও তাহলে নিশ্চয় কোন পাপ বা অন্যায় করেছিল এবং তাই শাস্তি পেয়েছিল।

❋ ৩ ❋

রাম-সীতা প্রেমকাহিনীর চারটি পর্ব।

'মিথিলা' পর্বে সীতার জন্মের (হলকর্ষণকালে মাটি থেকে শিশুকন্যার আবির্ভাব) পূর্বে জনকরাজের পক্ষে সুলভার স্মৃতিচারণ প্রাসঙ্গিক মনে হবে প্রেমকাহিনীর ভূমিকা হিসেবে। রাম-সীতার প্রাক-বিবাহ প্রেম দেখালে সম্পূর্ণভাবে রামায়ণ-বিরুদ্ধ হতো, কিন্তু হরধনুর একটা positive ভূমিকা ও রাম-সীতার প্রেমাপূর্বাভাসের কল্পনা দাম্পত্যশয্যায় অসম্ভব নয়।

'পঞ্চবটী' পর্বে সীতার প্রতি রামের আকর্ষণ 'মানুষ রাম'কে বাস্তব করে তুলতে পারে বলে মনে হয়। 'বনদেবী' বলে সীতাকে রামের সম্ভাষণ মাইকেল নিজেই কল্পনা করেছেন। সীতার নৃত্য-গীত সেই নিসর্গশোভার সাথে মানিয়ে যায়, যদিও করজোড়ে হাটু মুড়ে ঘোমটা দেওয়া ভঙ্গি আর অবিরাম অশ্রুজলে ধুয়ে যাওয়া মুখ ছাড়া সীতার অন্য কিছু আমরা জানি না।

'অগ্নিপরীক্ষা' পর্বে আদিকাব্যে রামের যে আচরণ ও সংলাপ আছে, তাতে রাম-মাহাত্ম্যে আবার কালোছায়া পড়ে। ধর্মের নামে নারী নির্যাতন, নারীর 'সতীত্ব' সম্পর্কে পুরুষের যথেচ্ছাচারী বিচারব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ ছাড়িয়ে আজ পর্যন্ত অনেকটাই রয়ে গেছে। মেয়েরা আজ পুরুষের পাশাপাশি আকাশপথে গ্রহান্তরে যাত্রার সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও। রামায়ণের পাঠক আশ্চর্য হতে বাধ্য—রাম নাকি সীতা-উদ্ধারের জন্য রাবণবধ করেনি। 'তুমি জেনো, এই রণ পরিশ্রম—সুহৃদগণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি —এ তোমার জন্য করা হয়নি।' বাল্মীকি রামের মুখ দিয়ে এমন কথাও বলিয়েছেন যে, সীতা ইচ্ছে করলে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা 'রাক্ষস বিভীষণ', যাকে খুশি গ্রহণ করতে পারে। সীতাচরিত্র সম্পর্কে রামের সন্দেহ পরিষ্কার : 'তুমি দিব্যরূপা, রাবণ তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে অধিককাল ধৈর্য ধরেনি।' বর্তমান কাহিনীতেও বিষ্ণু-অংশ রামকে এই সাধারণ ক্ষুদ্র মনের মানুষের পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যদিও পরে আভাস দেওয়া হয়েছে—ওই নিষ্ঠুরতা নাকি রামের মনের আসল রূপ নয়, লোকসমাজের চোখে অভিনয় করতে হয়েছিল তাকে। পাঠক কেমন ভাবে এই ব্যাখ্যা নেবে জানি না, কিন্তু সরলা সীতাচরিত্রের পক্ষে এই কথা বিশ্বাস করা সহজ।

'সীতার বনবাস' পর্বে বিশেষ পরিবর্তন নেই। শুধু যান্ত্রিক ভ্রাতৃভক্তির বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের সাময়িক 'বিদ্রোহ' নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে পারে যখন সে জানতে পারল সীতা গর্ভবতী। সামগ্রিকভাবে রাম-সীতা প্রেমের মধ্যে সীতার 'জনমদুখিনী' চরিত্র ও রামের প্রজানুরঞ্জনের নামে বেশ কিছু anti-people কৃতকর্ম বাদ যেতে পারে না। এই সব বজায় রেখে প্রেমপর্ব লিখতে হয়েছে। অযোধ্যার অশোক উপবনে রাম-সীতার প্রেমনিশি উৎসবে রাম সীতাকে 'মৈরেয় মদ্য' স্বহস্তে পান করিয়েছিল—এবং নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান হয়েছিল, এই সূত্র ধরেই প্রেমজাল বুনতে হয়েছে।

* ৪ *

'রামায়ণ প্রেমকথা'য় কালক্রম কঠোরভাবে মানা হয় নি। আদিকাব্যের ধারার আগু-পিছু ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। সেই হিসেবে আদি রামায়ণের ইতিহাস অনুযায়ী এখানে ঘটনার সেই পরম্পরা নেই। গল্পের মনোজ্ঞতার কথা ভেবে ফর্মুলাবিরুদ্ধ বিন্যাস করতে হয়েছে।

তবে ভাষার ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃত থেকে অনুবাদের বিষয়ে মূলতঃ রাজশেখর বসুর রামায়ণ অনুসৃত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাজশেখরের লেখার অংশবিশেষ অনুষ্ঠান প্রথার বিশদ বিবরণে ব্যবহার করেছি। সংস্কৃত ভাষার বাংলার অনুবাদে প্রতিভাবান পূর্বসূরির কথার সামান্য এদিক-ওদিক করেও এখানে লেখক কোন মৌলিকতার দাবি করতে পারেনা। ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা মূর্ত আছেই, সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা'র বহু শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে 'রামায়ণ-প্রেমকথা' লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছে অনেক সীমিতশক্তির এক লেখক। তবু তারই মাঝে নিজের স্পর্ধা দেখিয়েছি, ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে পণ্ডিতের ভ্রুকুটি তুচ্ছ করে। তারা সমালোচনা করলে দুঃখ নেই, কারণ শিক্ষায় লজ্জা কিসের! কিন্তু পাঠকের—যাদের আমার মতো সীমিত জ্ঞান বা আমার চেয়ে সামান্য বেশি জ্ঞান—তাদের যেন ভালো লাগে।

সেইটুকুই ভরসা।

আশা আছে, পাঠকের ভালো লাগতে পারে, কিছু নতুন স্বাদ তারা পেতে পারে, সেই পাঠকের 'বাণী (চিঠি বা টেলিফোন) লাগি কান পেতে রই।'

উত্তম ঘোষ

'মাঙ্গলিক'

কলিকাতা-৪৮

সূচীপত্র

কাহিনী		পৃষ্ঠা
দশরথ ও কৈকেয়ী	.....	১৭
বালী ও তারা	.....	৩৩
রাবণ ও মন্দোদরী	.....	৪৫
রাবণ ও বেদবতী	.....	৫৯
বিভীষণ ও সরমা	.....	৭৩
ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা	.....	৮৭
ভরত ও মাণ্ডবী	.....	১০১
লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা	.....	১১৫
রাম ও অহল্যা	.....	১২৯
রাম ও শবরী	.....	১৪৩
রাম ও সীতা ঃ মিথিলা	.....	১৫১
রাম ও সীতা ঃ পঞ্চবটী	.....	১৬৩
রাম ও সীতা ঃ অগ্নিপরীক্ষা	.....	১৭৫
রাম ও সীতা ঃ বনবাস	.....	১৮৯

দশরথ ও কৈকেয়ী

আজ নবরূপে সজ্জিত নগর গিরিরাজ। দিবালোকে আলোকিত, মধুনিষ্যন্দ গীতস্বর মুখরিত নৃপতি কেকয়ের প্রাসাদ। গোধূলি লগ্নে সন্ধ্যা সমীরণ যেন নৃত্যচারিণী, ফুল্লকুসুমিত প্রাসাদ কানন—যেখানে আজ নবরত্নখচিত শোভাময় মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে এক বর্ণাঢ্য উৎসব, যার শোভা রূপেশ্বরী রাজকন্যা কৈকেয়ী।

এখানে আজ স্বয়ম্বর সভা।

অন্তঃপুরে রাজবধূ বেশে সাজছে কৈকেয়ী। পরমা কৈকেয়ীর পরম প্রিয় পঞ্চসখী তাকে আজ এমন সাজে সাজিয়ে তুলবে যাতে কৈকেয়ী হবে ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ রাজবৃন্দের সকল আকাঙ্ক্ষার মনমর্মর, সকল মুগ্ধতার সারভূতা, সকল ইন্দ্রিয়ের চিরন্তন সুতৃপ্তি এবং সকল কামনার ও সাধনার অম্লান দীপ্তি। ললাটে কুঙ্কুমরেখা আর নয়নে অঞ্জনলেখা সমাপ্ত। দর্পণের সামনে যুগল বক্ষকে কাঁচুলির বাঁধনে গতিহারা করার আগে পরিহাস করে প্রিয় সখীর দল—গৌরাঙ্গী রাজকন্যা, আমরা সেই মুহূর্তটা কল্পনা করছি যখন তোমার ওষ্ঠ-লালিমা রক্তিম ফুলরেণু মুছে গিয়ে প্রিয় পতির সোহাগ দংশনে প্রকৃত রক্তাভ হয়ে উঠবে।

লজ্জায় আমোদিত কৈকেয়ীর হৃদয়। তার মানসলোকে এখনও স্পষ্ট নয় সেই সুদর্শনের অবয়ব। তবে ইতিমধ্যেই শুনেছে কৈকেয়ী—সহস্রাধিক বীরশ্রেষ্ঠ কন্দর্পকান্তি নৃপতি উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ম্বর সভাস্থলে। শুনেছে কৈকেয়ী, মহারাজ কেকয় পুলকিত কিন্তু চিন্তিত। পিতা উদ্বিগ্ন এবং অনিশ্চিত—কার কণ্ঠে কন্যার বরমাল্য স্থান পাবে, গিরিরাজ নগরের নৃপতিকন্যার কোন্ নির্বাচন নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে! কারণ, মহারাজ কেকয়ের চোখের সামনে সমুপস্থিত পাণিপ্রার্থীরা প্রায় সকলেই দেবতুল্য রূপ ও গুণের প্রতিনিধি। প্রাসাদকাননে আজ যত ফুল ফুটেছে, সেই শোভাকে ছাপিয়ে গেছে এই রাজন্যবর্গের রূপজ্যোতি। এরা প্রত্যেকেই যেন এক-একটি দিব্যময় পুষ্প, তাই পিতা ভাবনা-তাড়িত, কন্যা কৈকেয়ীর দোদুল্যমান চিত্ত শেষ পর্যন্ত কোনটিকে চয়ন করবে!

অন্তঃপুরে স্বভাবতই প্রিয় সখীদল আজ চপল ও কৌতুকময়ী। তারা প্রগলভা ও পুলকিতা। আনন্দে, হর্ষে উৎফুল্লা। চঞ্চলতায় উদ্বেল, উৎসাহে ফুল্লরা, তেমনি ফুল্লপ্রিয়া রাজকন্যা কৈকেয়ী। সখীদের হাস্য-পরিহাসে তার কৌমার্য্যের লজ্জা অন্তরে অন্তরে যেন এক দুঃসাহসী নির্লজ্জ রূপ পরিগ্রহ করতে কোন দ্বিধা অনুভব করে না।

একজন সখী বলে—বৃথাই আমার এত পরিশ্রম!

—কেন?—কৈকেয়ীর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—এত যত্ন করে এত সময় নিয়ে যে কাঁচুলি বন্ধনে তোমার যুগল সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ করছি, আড়াল করছি, প্রিয় পতির অস্থির হাতের চকিত-মধুর আস্ফালনে মুহূর্তের মধ্যে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই বলছি বৃথা এত—

—বৃথা নয়। কৈকেয়ীর অন্তরের সেই লজ্জা-বিজয়িনী সত্তা উত্তর দেয়—পলকে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে প্রস্তুতির প্রাচুর্য কখনও পিছিয়ে যায় না। তোমার সমস্ত যত্নশীলতা আর দীর্ঘস্থায়ী পরিচর্যা সার্থক ততই হবে, যত তাড়াতাড়ি তার অবসান হবে।

প্রিয়সখী বুঝতে পারে না কৈকেয়ীর কথার অর্থ।

কৈকেয়ী বলে—সারা রাত ধরে ঘাসের পাতায় শিশিরবিন্দু জমে ওঠে সূর্যোদয়ের এক লহমায় বিলীন হওয়ার জন্যে। সেই বিলীন হওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা। সূর্য্য কিরণের চুম্বন যদি কালক্ষেপ করতো তাতে কি প্রমাণ হতো না যে শিশিরকন্যাকে গ্রহণ করতে ভাস্কর-রশ্মি তেমন আগ্রহী নয়?

এইবার বুঝতে পারে প্রিয়সখী। রাজকন্যা কৈকেয়ী শুধু সৌন্দর্য-শ্রেয়সী নয়, তার হৃদয় ও মস্তিষ্ক সূক্ষ্মতায় পরিশ্রেষ্ঠা। কে জানে কোন রাজ্যের রাজমহিষী হবে এই কন্যা! একথা ঠিক, গিরিরাজ নগর তার পরমতমা এক সম্পদ হারাবে, কিন্তু অজানা সেই নগর, যা কৈকেয়ীকে বরণ করবে, সে হবে এক রূপরত্নের নব্য অধিকারী।

হঠাৎ মঙ্গলশঙ্খধ্বনি মুখর হয়ে ওঠে। চারিদিকে যেন ব্যস্ততার সাজ সাজ রব শোনা যায়। কুব্জা মন্থরা ছুটে আসে—দ্রুত প্রস্তুত হও কন্যা। মনে হয়, এইমাত্র শ্রেষ্ঠতম পুরুষ তোমার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। আর দেরি করো না। তোমার হাতের মালা যার গলায় মানাবে, যার আশ্রয়ে তোমার বধূবেশ সবচেয়ে বেশি মর্য্যাদা পাবে, তিনি এসে গেছেন।

রাজকন্যা কৈকেয়ী ও সখীর দল সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কয়েকজন দ্রুত গতিতে প্রাসাদ অলিন্দে ছুটে যায় এবং সত্বর ফিরে আসে। তারা বিমুগ্ধ, উত্তেজিত ও অধৈর্য্য। ক্ষিপ্রহাতে রাজকন্যার বধূসজ্জা সমাপন করতে হয়। রূপলাবণ্যে উদ্ভাসিতা কৈকেয়ী প্রশ্ন না করে পারে না—মন্থরা কি সত্য বলেছে প্রিয়সখী?

—অবশ্যই। তোমার সুযোগ্যতম পাণিপ্রার্থী এইমাত্র রথ থেকে নামলেন। মনে হল যেন দশদিক আলোকিত এক নতুন জ্যোতি-বিকিরণে।

—কে সে?—কৈকেয়ীর নিঃশ্বাসবায়ু এবার এক রম্যময় অস্থিরতায় আকুল।

প্রিয়সখী বলে—অযোধ্যানৃপতি দশরথ।

২

সূর্যবংশজাত মহারাজ দশরথ তিরিশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। অনেকের আশঙ্কা ছিল—কোনো এক দৈববিধানে এই রাজচক্রবর্তী দশরথকে বোধহয় চিরকুমার

থেকে যেতে হবে। সহসা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যার সাথে বিবাহের জন্য দশরথের কাছে প্রস্তাব এল। দ্বিজবরের মুখে বিস্তারিত বিবরণে রাজা দশরথ আকৃষ্ট হলেন। কৌশল্যার সাথে বিবাহে বিদ্যাধরীদের সাথে নর্তক-নর্তকীদের দল ও বাদকবৃন্দ এক মহোৎসবে মেতে উঠেছিল। তুরী, ভেরী, ঝাঁঝরি, পাখোয়াজ ইত্যাদি পঞ্চাশ সহস্র বাদ্যযন্ত্র, তিন কোটি শিঙ্গা এবং আরও তিন কোটি শঙ্খ ঘণ্টা ও সহস্র সানাইয়ের ছন্দশব্দে মনে হয়েছিল প্রলয়কাল যেন মহানন্দে সমাগত। কোশলরাজ কন্যাসহ অর্ধ রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন ধর্মবীর রাজা দশরথকে।

কৌশল্যা দশরথের প্রথম পত্নী, প্রধানা রাজমহিষী।

কৈকেয়ী জানত, সে দ্বিতীয়া। তার স্থান মহারাণী কৌশল্যার পরে। ক্ষত্রিয় সমাজনীতি অনুযায়ী তাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হয়নি কৈকেয়ী। সে জানত, কৌশল্যা গুণবতী, বিদূষী। কিন্তু রূপের ঐশ্বর্য্যে কৈকেয়ীর স্থান কৌশল্যার উপরে; অযোধ্যার অন্তঃপুরের সরোবর সলিলে কৈকেয়ী সবচেয়ে বড় বিকশিত এক শতদল; অযোধ্যার আকাশে কৈকেয়ী সবচেয়ে বড় নক্ষত্র যার দিকে সন্ধ্যালগ্ন থেকে মধ্যরাত—এমনকি সারারাত—নৃপতি দশরথের অপলক দৃষ্টির মুগ্ধতা সদা ঘনীভূত হয়ে উঠবে। থাকুক কৌশল্যার হাতে রাজরত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি, কৌশল্যা হোক রাজমন্দিরের উষাকালীন পূজারিণী—তাতে কোন আক্ষেপ নেই। কৈকেয়ী দশরথের প্রেমময় হৃদয়কোষে মুক্তা হয়ে থাকবে চিরকাল; দশরথের অন্তর-মন্দিরে সে পূজারিণী হবে না, সে হবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সে হয়ত পূজা দেবে, আবার পূজা পাবে।

এই পূজার নাম প্রেম।

গিরিরাজ নগরের প্রাসাদ কাননে স্বয়ম্বর সভার সকল আলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে সখীদলসহ উপস্থিত হলো জ্যোতির্ময়ী কৈকেয়ী। চন্দ্রমুখী, আয়তলোচনা, উন্নতবক্ষা, সুমধ্যমা, গুরুনিতম্বিনী কেকয়কন্যা। সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো বারেকের জন্যেও মুখ তুলল না সে। ধীর আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপে বরমাল্য হাতে সে এগিয়ে গেল একটি নির্দিষ্ট আসনের দিকে। এইবার মুখ তুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য সারা স্বয়ম্বর সভার অভ্যাগতদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা ব্যাকুল প্রত্যাশা নিরীক্ষণ করলো কৈকেয়ী। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। বুঝতে অসুবিধা হলো না—আজ নিশাগমের প্রথম লগ্নে—এখানকার আকাশ অবশ্যই নক্ষত্রখচিত—কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণ শশধর একজনই।

নৃপতি দশরথের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে কৈকেয়ী। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের আগেই কৈকেয়ীর মনোবীণায় প্রার্থনার ঝংকার নীরবে বেজে ওঠে—রূপ ও রত্নে আমি ঐশ্বর্য্যময়ী হয়েও তোমার কাছে নিঃস্ব কাঙ্গালিনী। তুমি আমার মালা গ্রহণ করে আমাকে সম্পদশালিনী করো।

নবদম্পতি যাত্রা করল অযোধ্যাপথে। রাজা কেকয় রাজকোষ উজাড় করে দিলেন—কন্যারত্নের সাথে আরও বিবিধ রতন। কুব্জা মন্থরা হল কৈকেয়ীর সাথী। সে অযোধ্যার নতুন রাণীর পরিচারিকা ও বিশ্বস্তা প্রবীণা উপদেষ্টা।

রাজা দশরথ ঈষৎ কৌতুক করেছিলেন—রত্নসম্পদ আমার যথেষ্টই আছে। এখন এক পরম রত্ন নিয়ে যাচ্ছি গিরিরাজ নগর থেকে। আমি সৌভাগ্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু কন্যাদানসহ অপরাপর কন্যারত্নরা কই? এই কুব্জাই কি তাদের প্রতিনিধি?

রথে বসে দশরথের গলা জড়িয়েছিল কৈকেয়ীর দুই সতেজ বাহুলতা। সে বাহু অতি নরম ললিত স্বর্ণলতিকা নয়। নৃপতি দশরথের বুকে মাথা রেখে বলেছিল কৈকেয়ী—চাঁদের গায়ে কলঙ্কের দাগ থাকে, নিশ্চয় জানো?

—অবশ্যই জানি।

—সেই কলঙ্কের সামান্য কৃষ্ণচ্ছটা চন্দ্রমার সৌন্দর্য্যকে কি আরও মনোরম করে তোলে না?

—অবশ্যই তোলে।

—আমি সেই চন্দ্রমা, আর ওই কুব্জা মন্থরা আমার সেই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী রূপকলঙ্কিনী। আমি কায়া, সমুজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে থাকব তোমার চোখের তারায়, আর ও আমার ছায়া, অন্ধকারে চলবে আমার পাশে পাশে। ওকে ঘৃণা ক'রোনা তুমি। ও আমায় আজন্ম মাতৃস্নেহে লালন করেছে।

যেন কিছুটা অপ্রতিভ হন নৃপতি দশরথ। বলেন—ঠিক কথা, তোমার পিতা যথার্থ কাজ করেছেন। অযোধ্যায় তুমি অনেক পরিচারিকা পাবে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীসৃদশা রাজমহিষী কৌশল্যাকে পাবে, কিন্তু মাতৃস্নেহ পাবে না। তাই—

দশরথের কথা শেষ হয় না। কৈকেয়ীর প্রেমঘন করতলের দৃঢ়চাপে ক্ষণকালের জন্য বাক্যহারা রাজা দশরথ। কৈকেয়ী বলে—আমি মানবজন্মের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ পেয়েছি প্রিয়স্বামী। আর আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু এইখানে আমি যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে আমার মনের মন্দির গড়তে পারি।

রাজা দশরথের প্রশস্ত বক্ষে অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে এক গোলাকৃতি নখচিহ্ন এঁকে দেয় কৈকেয়ী। রাজা দশরথ আবার পরিহাস করেন—সমস্ত হৃদয়রাজ্যটা যদি অধিকার করে নাও, তবে কৌশল্যা থাকবে কোথায়?

কৈকেয়ী হাসে—সারা রাজ্য দখল করিনি প্রিয়। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে অগ্রজা কৌশল্যার স্থান নির্দিষ্ট করা রয়েছে। আমার নখক্ষতে তোমার বুকে যে নতুন মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, স্বার্থপর আমি, তাই তার বৃহৎ অংশটুকু আমার। কিন্তু আমি কৃপণ নই প্রিয়, আর তাই বোধহয়—

এবার উচ্ছল হেসে মাঝপথে চুপ করে যায় কৈকেয়ী। রথচক্রযান এগিয়ে চলে। ঘর্ঘর নিনাদ, অশ্বের হ্রেষারব।

চমকিত দশরথ প্রশ্ন করেন—কথা অসমাপ্ত কেন প্রিয়ে? বৃহৎ অংশ যে তোমার তা আমায় কুণ্ঠাহীন হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে। মহিষী কৌশল্যার জন্য তুমি স্থান রেখেছ, তুমি অকৃপণ নও, তাই আর কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?

এবার নৃপতি দশরথের চিরউন্নত মস্তক নিজের বক্ষে টেনে নেয় কৈকেয়ী। নিবিড় ঘন বন্ধন। তারপর দশরথের কানের কাছে মুখ নামিয়ে চুপিসারে এক সঙ্কেত বার্তা শোনায় কৈকেয়ী—আর একটু জায়গা রাখলাম। এত আনন্দের মুহূর্তেও কেন জানি মন বলছে, আমি তোমার প্রেমের সিংহাসনে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেও আমি সর্বশেষ নই, শেষ ইতিরেখা নই, আরেক জন আসবে।

—কী বলছ তুমি!

কৈকেয়ীর বক্ষলগ্না রাজা দশরথের মস্তিষ্কের স্নায়ুশিরা অপ্রত্যাশিত সঙ্কেত বার্তায় সচকিত হয়—তোমায় পাওয়ার পর আমার আর এমন কোন অভিলাষ নেই প্রিয়ে। রাজমহিষী কৌশল্যা, আর তুমি—আর অতিরিক্ত আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

কৈকেয়ী হাসে—তবু মনে হচ্ছে আমার পরে আরেকজন আসবে। কিন্তু তাতে আমার কোন আক্ষেপ-আশঙ্কা নেই। বরঞ্চ আমি এক অগ্রজা ভগিনীর মর্যাদা পাব, তাকে বরণ করে পুলকিত হব। অযোধ্যানগরে আজকের দিনটির আনন্দ উৎসবের পরে—হয়তো বেশ কয়েক বছর পরে—আবার একটা উৎসবের লগ্ন ঘনিয়ে এলে ক্ষতি কি!

—ক্ষতি নেই? কী বলছে তোমার মন?—দশরথের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

কৈকেয়ীর হাসি এবার উচ্চগ্রামে, জলতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কর্ণকুহরে আবার মৃদু গুঞ্জন। শুনতে পান রাজা দশরথ—আমার কিসের ভয়! তারা দুজনে—কৌশল্যা এবং সে—হবে তোমার দুই নয়ন, আর আমি থাকব তোমার হৃদযন্ত্র। নয়ন দৃষ্টি শক্তি হারালে অন্ধ কিন্তু বেঁচে থাকে, কিন্তু হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হলে প্রাণস্পন্দন শেষ। ওরা না থাকলেও রাজা দশরথ, যতই বিক্ষত হোক, থাকবে। আমি না থাকলে তুমিও থাকবে না।

কৈকেয়ীর বক্ষে নবস্বপ্নে বিভোর রাজা দশরথের হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যায়। সচকিত হয়ে উঠে বসেন।

উৎকণ্ঠিত কৈকেয়ী জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে?

—এক অশুভ বার্তা স্মরণে এল প্রিয়া।

—অশুভ?

—হ্যাঁ। অযোধ্যাপুরীতে পৌঁছেই কালকেই আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

—কেন? যেন আর্তস্বর ধ্বনিত হয় কৈকেয়ীর কণ্ঠে।

দশরথ বলেন—অসুর সম্বর অমরাবতী আক্রমণ করবে। ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে জানিয়েছেন আমায় আমন্ত্রণ করতে। ইন্দ্র এসে আমায় বলেছেন—তুমি আমার মিত্র, এই সঙ্কটে সম্বর অসুরবিনাশ তোমার দ্বারাই সম্ভব। সমগ্র বৈজয়ন্তধাম তোমার অপেক্ষায়।

এইবার যেন পাষাণপ্রতিমা কৈকেয়ী। কিন্তু তার পাষাণপ্রতিমা দেহে মানবী হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

দশরথ বলেন—কালই আমাকে সম্বর অসুর নিধনে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে প্রিয়া। যদি